নারী-পুরুষের মানস : পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বৈষম্যের জৈবসামাজিক ভিত্তি

মনিরুল ইসলাম

নারীসুলভ (আচরণ) বলতে (নারীর) এমন ধরণের আচরণকে বোঝায় যা পুরুষকে (ক্ষমতাবান লিঙ্গ হিসেবে) প্রীত করে, কারণ এ ধরণের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে নারী তার অধীনস্ত অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। অতএব, নারীসুলভ আচরণ (আসলে) নারীর টিকে থাকার কৌশল।[১]

– গ্রাহাম, রাউলিং ও রিগ্‌সবি
Loving to Survive, 1994

পৌরুষ একটি সমাজসৃষ্ট ধারণা যা বেশ কয়েকটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গায়ের জোর, আগ্রাসী মনোভাব এবং হিংস্র আচরণ। ... হিংস্রতা হচ্ছে একরকম "প্রতিযোগিতামূলক পুরুষালী খেলা" যা একজন পুরুষ খেলতে শেখে তার সামাজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ... এই 'খেলা' তাকে পৌরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।[২]

– অলংকার শর্মা ও অর্পিতা দাশ
Men Masculinity and Violence

"পিতৃতন্ত্রের প্রতিটি পরিপ্রেক্ষিত... নারী ও পুরুষের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করে। এর মুখ্য ফলাফল হল পিতৃতান্ত্রিক আদর্শের আত্মীকরণ। সামাজিক মর্যাদা, মানসিক ধাত এবং (সামাজিক) ভূমিকা ইত্যাদি হচ্ছে আধিপত্যের সেই সব পদ্ধতি যার অসংখ্য জটিল মানসিক শাখা প্রশাখা রয়েছে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই। পিতৃতান্ত্রিক বিয়ে, পরিবারের মর্যাদা কাঠামো ও শ্রম-বিভাজন এগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। পুরুষের উৎকৃষ্টতর এবং নারীর নিকৃষ্টতর আর্থিক অবস্থারও (এক্ষেত্রে) কঠোর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।"[৩]

কেট মিলেট
The Sexual Politics, 1969

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর পত্রের গল্পে এক ইংরেজ ডাক্তার এসেছিলেন মৃণালদের (মেজো বউ) বাড়ির অন্দরমহলে। আঁতুর ঘর আর অন্দরমহলে মেয়েরা যে পরিবেশে থাকে তা কতটা অবহেলিত ও অস্বাস্থ্যকর সেটা দেখে ডাক্তার আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়েছিল। মৃণাল বলছে– "ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বোধ হয় আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ... আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো আর অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যেই তার বেদনা নেই। তাই মেয়ে মানুষ দুঃখবোধ করতেই লজ্জা পায়।" কঠোর পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন ও বঞ্চনার মধ্যে থাকা ব্যাপক অধিকাংশ নারীর মানসিকতায় আত্মসম্মানবোধের অভাব, না পাওয়াকে মেনে নেয়ার প্রবণতা, আপোষকামী, ভীরু ও অন্তরমুখী মনোভাব ও আচরণের উপস্থিতির কারণে আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে তাদের সার্বজনীন 'জন্মগত' বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিগত বলে মনে হয়। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ নারীর মধ্যে দৃশ্যমান এধরণের প্রবণতা গড়ে ওঠে নিপিড়নমূলক একটি ব্যবস্থার ভেতর টিকে থাকা বা এর সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টা থেকে। পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বেড়ে ওঠা নারীর মানসকে তুলনা করা যায় দীর্ঘদিন বন্দীত্বে বা দাসত্বে আবদ্ধ জনগোষ্ঠির মানসিক প্রবণতার সঙ্গে। দাসত্ব ও নিস্পেষনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা যেখানে বঞ্চনা ও নিস্পেষনের দুঃখবোধকে চাপা দেয়। যেহেতু এ ধরণের কাঠামো থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত কোন সমাজ নেই, 'সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত' সমাজে বেড়ে ওঠা নারীদের মন ও মানসিক প্রবণতা কেমন হতে পারত তা হয়ত আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই।'[৪]

'বন্দীত্ব ও দাসত্বের' মধ্যে গড়ে ওঠা এই মানসিকতার অনেকটাই (যা এই সমাজে 'নারীসুলভ' মানসিকতা বলে প্রচলিত) নারীর প্রকৃতিগত কিংবা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ নারী যখন অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে বড় হতে পারে কিংবা পুরুষতান্ত্রিক ধারণার প্রভাব কাটিয়ে কিছুটা মুক্তভাবে ভাবতে পারে তাদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী 'নারীসুলভ' মানসিকতা ও আচরণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। মেজবৌ (মৃণাল), বড়বৌ এবং বিন্দু, উল্লেখিত গল্পটিতে উপস্থিত এই তিনজনই জন্মগতভাবে নারী। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান এবং এর সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রয়োজনেই তাদের মন, মানসিকতা এবং আচরণগত বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দেখা যায় বিস্তর ফারাক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর হীনতা, অধস্তনতা ও বন্দীত্বকে 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' একটি বিষয় বলে দেখানোর প্রচেষ্টা সার্বজনীন। কারণ এর মাধ্যমে নারীকে ওই অবস্থার মাঝে আটকে রাখা সহজ হয়। নারী যত কঠিন পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়, তার মধ্যে কথিত 'নারীসুলভ' মানসিকতা ও আচরণের প্রবণতা তত গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এ ধরণের একটি সমাজে ব্যাপক অধিকাংশ নারীর মধ্যে এ ধরণের প্রবণতার উপস্থিতির ফলে আপাতদৃষ্টিতে একে সার্বজনীন বলেও মনে হয়।

অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদলেই গড়ে ওঠে পুরুষালী-মনোভাব সম্পর্কে এ সমাজে প্রচলিত ধারণাগুলো। সমাজের ব্যাপক অধিকাংশ পুরুষের মানসিকতা এ ধরণেরই বা এর কাছাকাছি যা সে এ সমাজে বেড়ে ওঠার সময়ই শেখে। এ আদর্শ অনুযায়ী পুরুষালী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠোরতা, নির্বিকারত্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-ভঙ্গী, আবেগ ও সংবেদনশীলতা-বর্জিত মনোভাব, সম্পর্কিত বা অন্তরঙ্গ হবার প্রবণতার অভাব ইত্যাদি।[৪] বালকেরা এগুলো শেখে তাদের আসে পাশের পুরুষদের কাছ থেকে, সামাজিক রীতি নীতি সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এবং বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকেও। সামাজিকভাবে স্বীকৃত মানসিকতা ও আচরণ-সম্পন্ন 'পুরুষ' হয়ে ওঠার জন্য বালকেরাও বেশ চাপে থাকে।

কারণ সেরকম হতে পারায় ব্যর্থ পুরুষের 'মেয়েলী' বলে টিটকারী জোটে যা পুরুষের জন্য সামাজিকভাবে 'অপমানজনক'। এই 'পুরুষালী' মনোভাব ও আচরণ নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। সাম্প্রতিক অনেক গবেষণায় দেখা গেছে ছেলে শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াই তাকে আবেগহীন হতে শেখায়। বেড়ে ওঠার সময় 'আত্ম-নির্ভরশীল হবার চাপ' নারীর তুলনায় পুরুষকে করে বেশি আত্ম-কেন্দ্রিক যা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তাদের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পারিবারিক জীবনে অন্যদের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়া কিংবা মতামতের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তার বড় ধরণের ঘাটতি থাকে। আবেগ যখন পরিণত ও সংহত না হয় তখন তা মানসিক সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা তার অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুরুষের ক্ষেত্রে যা আমরা আধিপত্যমূলক, হিংস্র, নিপীড়ণমূলক ইত্যাদি মনোভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি।[৫]

'নারীসুলভ' বা 'পুরুষালী' আচরণ ও মানসিকতা বলতে এখানে যা বোঝানো হচ্ছে তা তাদের জৈবিক যৌনতাকে নির্দেশ করে না এগুলো মূলত লিঙ্গীয় ধারণা (gender concept)। অর্থাৎ জৈবিক যৌনতা সম্পর্কে সামাজিক ধারণা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিঙ্গীয় ধারণা সরাসরি জৈবিক যৌনতার উপর নির্ভর করে না। বরং সামাজিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বতন্ত্রভাবেও গড়ে ওঠে। মানসিক প্রবণতাসমূহ যেমন– আচরণ, অনুভূতি, ভাবনা, ফ্যান্টাসি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে জৈবিক নয়। বরং তা গড়ে ওঠে জৈবিক ও সামাজিক বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়ায়। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের সমাজে প্রচলিত যে সব ধারণা রয়েছে তাতে মোটা দাগে এগুলোকে তাদের জৈবিক বা জন্মগত প্রবণতা বলে বিবেচনা করা হয়। এসব ধারণা গড়ে গঠার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থান এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জৈবিক সত্ত্বা হিসেবে নারী ও পুরুষের আচরণ ও মানসিকতা সম্পর্কে প্রচলিত এসব ধারণার মধ্যে রয়েছে নানা অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা। ধারণাগুলো সাধারণভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে নারী ও পুরুষের ভূমিকার যথার্থতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রচলিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ধারণা নারীকে পুরুষের চেয়ে হীনতর এবং নির্ভরশীল জীব হিসেবে উপস্থাপন করে। কখনও কখনও তাকে কিছুটা 'গৌরব' দেয় যা আসলে এক ধরণের বিভ্রম এবং সঠিক বিচারে নারীকে আরও বড় দায় ও বন্ধনের দিকে ঠেলে দেয়। নারী-চরিত্রের 'সর্বংসহা' রূপটি এরকম একটি সমাজসৃষ্ট বিভ্রম। পুরুষতন্ত্র নারী ও পুরুষের কাছে যে মনোভাব ও আচরণ আশা করে তাকে 'জৈবিক' প্রবণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে এগুলোকে 'প্রাকৃতিক', 'স্বাভাবিক', 'পরিবর্তনযোগ্য নয়' কিংবা 'গ্রহণযোগ্য' বলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

মানুষের মন হচ্ছে তার বোধের সেই অংশ যা কতগুলো অংশ নিয়ে গঠিত হয়, সেগুলো হচ্ছে তার চেতনা, কল্পনা, উপলব্ধি, চিন্তা, বিচারশক্তি, ভাষা ও স্মৃতি। এগুলো মূলত তার মস্তিষ্কের ভেতরেই থাকে এবং এটি মস্তিষ্কের সেই অংশ যেখানে আমাদের চিন্তা ও চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। আমাদের কল্পনাশক্তি, পছন্দ ও অভিরুচিকে ধারণ করে মন। আমাদের আবেগ ও অনুভূতি কীভাবে গড়ে উঠবে তার নির্ধারকও মন। এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে আমাদের প্রবৃত্তি, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব (যেগুলো মানসের প্রকাশিত রূপ)। আমাদের অন্যান্য অনেক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মত আচরণগত প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক সক্ষমতা ইত্যাদিও জন্মগতভাবে নির্ধারিত নাকি সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। একটি চরম মত হল মানসিক প্রবণতাগুলো পরিপূর্ণভাবে জৈবিক ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। অন্য চরম মতটি হল অভিজ্ঞতাবাদী, এ মত অনুযায়ী জন্মের পর মানুষের মন খাতার 'সাদা পাতার' (tabula rasa) মত থাকে। পরবর্তী সময়ে অভিজ্ঞতার 'লিখনে' তা ক্রমান্বয়ে ভরে উঠতে থাকে। অতএব, এ মত অনুযায়ী মানুষে মানুষে মানসিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা সর্বাংশেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতার ফলে ঘটে থাকে। বর্তমান যুগে এই চরম মত কারও কাছেই বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। উভয় দিকেই অনেক নিদর্শন ও যুক্তি রয়েছে যা চরম অবস্থানের বিরুদ্ধেই যায়। অতএব, 'মানসিক বৈশিষ্ট্যের উৎস কি জৈবিক না অভিজ্ঞতালব্ধ ?' আধুনিক যুগে প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা হল 'মানসিক বৈশিষ্ট্যের উৎস কতটা জৈবিক এবং কতটা অভিজ্ঞতালব্ধ?' অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান এর উৎস হিসেবে প্রকৃতি (Nature) ও পরিবেশ (Nurture) উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে নিশ্চিত করে।

প্রচলিত ধারণা এবং পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত লিঙ্গীয় ধারণার প্রভাব কাটিয়ে নারী-পুরুষের মানস সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পেতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের পথ দিয়েই এগুতে হবে। বিজ্ঞানের যে সব শাখা এ সংক্রান্ত অনুসন্ধানও গবেষণা করে তার মধ্যে মনস্তত্ত্বই (psychology) প্রধান। এছাড়া রয়েছে নৃতত্ত্ব (Anthropology), সমাজ বিজ্ঞান, বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়োজিত ব্যক্তিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই মানুষ যিনি নিজেও হয়তো এসব ধারণার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের উর্ধ্বে নন।

প্রচলিত ধারণা এবং পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত লিঙ্গীয় ধারণার প্রভাব কাটিয়ে নারী-পুরুষের মানস সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পেতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের পথ দিয়েই এগুতে হবে। বিজ্ঞানের যে সব শাখা এ সংক্রান্ত অনুসন্ধানও গবেষণা করে তার মধ্যে মনস্তত্ত্বই (psycholog) প্রধান। এছাড়া রয়েছে নৃতত্ত্ব (Anthropology), সমাজ বিজ্ঞান, বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়োজিত ব্যক্তিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই মানুষ যিনি নিজেও হয়তো এসব ধারণার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের উর্ধ্বে নন। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গীয় ধারণার প্রভাব কেবল সাধারণ নারী-পুরুষের চিন্তা ও উপলব্ধির মাঝেই আছে তা নয় বরং তা প্রভাবিত করে মনস্তত্ত্বের গবেষক ও চিন্তাবিদদেরও। এই প্রভাবের কারণে তারা নারীর মানস সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা হাজির করেন যাতে নারীর নানান মানসিক সমস্যা ও বিচ্যুতির কারণ হিসেবে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নিষ্পেষণের প্রধান ও নিয়ন্ত্রক যে ভূমিকা রয়েছে তা আড়াল হয়ে যায়। কিংবা ব্যাখ্যা এমন হয় যে মনে হয় সমস্যাটা নারী 'অন্তর্গত' বা 'সহজাত'। এ সমস্যার কারণে সমাজে মানিয়ে নিতে না পারার দায় নারীর উপরেই চাপানো হয়। নারীবাদী লেখক জারমেইন গ্রিয়ার লিখেছেন– (সমাজে ও পরিবারে) "নারীরা যে চাপ ও দুর্দশার মধ্যে থাকেন তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় অতএব (তাকে আড়াল করার জন্য) তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে।"[৬] যেমন– নারীর মানসিক 'দুর্বলতা' এবং মানাসিক অসুস্থতা তার 'অন্তর্গত' বা 'সহজাত'। এ ধরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে

সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন মন-সমীক্ষণের (psychoanalysis) ধারার বা ফ্রয়েডীয় ঘরানার মনস্তত্ত্ববিদেরা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনস্তত্ত্বের জগতে এদের প্রভাব এত গভীর ছিল যে এমনকি নারী মনস্তত্ত্ববিদেরাও এই প্রভাব কাটাতে পারেননি। পিতৃতান্ত্রিক ধারণার প্রতি মনস্তত্ত্ব ও মন-চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই পক্ষপাত এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও ব্যাপ্ত ছিল। সর্ষের মধ্যের এই ভূত একবিংশ শতাব্দীতেও সর্বাংশে নির্মূল হয়নি।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রথমে নারীবাদী লেখকেরা এর পর নারী মনস্তত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেন যে পুরুষতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত-দুষ্ট সমাজ কাঠামো এবং প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত যৌনবৈষম্যবাদের (sexism) কারণে নারী ও মনস্তত্ত্ব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে অ্যাগনেস ওকোনেল এবং ন্যান্সী রুশো তাদের সাড়া জাগানো Women's Heritage in Psychology: Past and Present-প্রবন্ধে দেখান (বিগত কয়েক দশকের কথা বাদ দিলে) মনস্তত্ত্বের ইতিহাস হচ্ছে সামাজিকভাবে পুরুষের দ্বারা এবং পুরুষের জন্য তৈরী একটি বিষয়। নারীবাদী লেখক, গবেষক এবং মনস্তত্ত্ববিদগণ (গত শতাব্দীতে) এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 'অদৃশ্য' থেকে গেছেন। গত শতাব্দীর শেষের তিন দশকে আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে জ্ঞানের এই শাখায় নারীরা ক্রমাগতভাবে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছে। এসময়ের নারী মনস্তত্ত্ববিদগণ পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত লিঙ্গীয় ধারণার প্রভাব কাটিয়ে নতুনভাবে নারীর মানসিকতা সম্পর্কে তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিয়োজিত হন।

নারী-পুরুষের মানস কেবল নেচার ও নারচারের মিথস্ক্রিয়া বিষয়টি বোধ হয় এতটা সরল নয়। মানসের উৎস ও গতি-প্রকৃতির জৈবিক মাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই কেবল শারীরতত্ত্বের ব্যাপার নয় এবং সামাজিক মাত্রাও কেবল সমাজতত্ত্বের ব্যাপার নয়। এখানেই বিষয়টি মনস্তত্ত্বের সীমা ছাড়িয়ে নারীবাদী অনুসন্ধানের সীমার মধ্যে চলে আসে। যেমন, যে কোন বৈষম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত হুমকি, বল-প্রয়োগ ও নির্যাতনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে হীনতর অবস্থানের কারণে নারীর উপর বল-প্রয়োগ ও নির্যাতন প্রায়ই দেখা যায়। তবে জৈবিক কারণে নারীর উপর বল-প্রয়োগ ও নির্যাতন যৌন-নির্যাতনে পরিণত হয়। আবার যৌনতৃপ্তি লাভের জন্য অনেক পুরুষ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অসহায় নারীর উপর যৌন-নিপীড়ন চালায়। যৌন নিপীড়ণের ব্যাপারটি শুধু যৌনতার ব্যাপার নয়, এতে শারীরিক লাঞ্ছনার ক্ষতির চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক হয় মানসিক ক্ষতি। মানসিক ক্ষতি আবার কেবল শারীরিক লাঞ্ছনার সমানুপাতিক নয়, এর সামাজিক প্রতিক্রিয়াই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যৌনতা-সংক্রান্ত গ্লানি ও অপরাধবোধের সিংহভাগই নারীর উপর বর্তায়, যৌনতা যে ধরণেরই হোক এসমাজের রীতি অনুযায়ী নারীর দোষ, নিন্দা বা 'কলঙ্ক' বেশি হয়। তাই এ সমাজে, যে নারী নির্যাতিত হয়েছেন এবং যিনি হননি উভয়কেই শারীরিকভাবে নির্যাতিত হবার ভয় সার্বক্ষণিকভাবে তাড়া করতে থাকে। এধরনের বাস্তবতাকে ভেতর থেকে দেখবার চোখ না থাকলে নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব হবে না। (চলবে)

মনিরুল ইসলাম: লেখক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
ইমেইল: monirul852@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. Graham D L R, Rawlings E I and Rigsby R K : *Loving to Survive: Sexual Terror, Men's Violence and Women's Lives;* New York University Press, New York and London,1994, pp. xiv (Preface)

২. Alankaar Sharma and Arpita Das: The Editorial of the Graduate Journal of Social Science (GJSS), November 2016, Volume 12, Issue 3; pp- 7

৩. Kate Millet : *The Sexual Politics;* University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1969 (Reprinted on 2000), pp-54

৪. Graham D L R, Rawlings E I and Rigsby R K cÖv¸³|

৫. Erin D. Reilly, Aaron B. Rochlen, and Germine H. Awad: Men's Self-Compassion and Self-Esteem: The Moderating Roles of Shame and Masculine Norm Adherence; in Psychology of Men & Masculinity, 2013, American Psychological Association2013, Vol. 14, No. 1, 0001524-9220/13/$12.00 Doi: 10.1037/A0031028

৬. Germaine Greer: *The Female Eunuch;* in the chapter Psychological Cell, Paladin, London,1970, pp-90

এক বছর আগের তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি

পণ্য	বর্তমান দাম (কেজি)	মূল্যবৃদ্ধির হার
পেঁয়াজ	১৪০-২৩০	৫৭৩%
রসুন	১৪০-১৮০	১৬৭%
আদা	১২০-১৮০	৩৬%
শুকনা মরিচ	১৮০-৩২০	২৫%
মসুর ডাল	৫৫-১২৫	২০%
গরুর মাংস	৫৩০-৫৫০	১২.৫%
চিনি	৫৮-৬০	১৪.৫৬%
ডিম (৪টি)	৩৩-৩৫	১৩%

সূত্র : টিসিবি

সূত্র: প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯

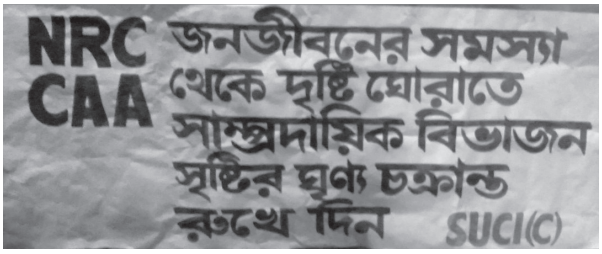

ভারতের সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের পোস্টার: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত